ভোঁদড় বাহাদুর



গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোঁদড় বাহাদুর

সিগনেট প্রেস । কলকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
মুদ্রক
ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭।২ গ্রাণ্ট লেন
ব্লক করেছেন
রূপমুদ্রা লিমিটেড
২ বহুবাজার লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট

দাম দেড়টাকা

রচনাকাল
১৩৩৩ সাল

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

পীযূষ মিত্র

ছবি এঁকেছেন

বিরূপ দত্ত

ভোঁদড় বাহাদুর



আজ নবমী পুজোয় পাড়ার মল্লিকবাবুদের বাড়িতে ভয়ানক ধুম। বোমা, দুদমা, ঢাক, ঢোল, সানাই আর তিন দল ইংরেজি বাজনার বেজায় আওয়াজে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না।

রাত একটা কি দেড়টার পর বেশ একটু তন্দ্রা আসছিল। এমন সময় আমার কানের কাছে কে বললে, "কি ভায়া, আমায় চিনতে পার?"

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি, আমাদের চৌতলার ছাতের বুড়ো ভোঁদড় খুব জমকালো মখমলের সাজ-গোজ পরে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকছে।

অনেক দিন পরে তাকে দেখে বড় খুশি হলুম। একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে জিগগেস করলুম, "ভোঁদড় দাদা, এত রাত্তিরে সাজ-গোজ করে কোথায় চলেছ? মল্লিকবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল বুঝি?"

বুড়ো সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে বললে, "ভায়া, তুমি তো বেশ জানো, তোমার ঠাকুরদাদার আমল থেকে আমরা তোমাদের চৌতলার ছাতের একটা ভাঙা পিল্‌পের ভিতর ঘরদোর বানিয়ে এতকাল নিরাপদে

বাস করে আসছি। কিন্তু আজ সেখানে যা ব্যাপার হয়েছে, তাতে ছেলেপিলে নিয়ে ওখানে আর থাকতে সাহস হয় না। তাই অসময়ে তোমার ঘুম ভাঙাতে হল।"

আমি বললুম, "ব্যাপারখানা কি? শিগগির খুলে বল শুনি।"

বুড়ো বলতে লাগল, "রাত বারোটায় আহারাদি করে আমার তাল-বেতাল-সিদ্ধ লাঠি ঘাড়ে বাড়ির আলসের চারদিকে আজও বেড়াচ্ছিলুম, এমন সময় হঠাৎ দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড কালো বেড়ালের মতো জানোয়ার তোমাদের আঁতুড়ঘর থেকে একটি কচি ছেলে চুরি করে পালাচ্ছে। এই দেখে আমি লাঠি ঘুরিয়ে হার-রে-রে-রে করে হাঁক-ডাক ছেড়ে ছুটে গিয়ে যেমন তার পিঠে সজোরে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়েছি, অমনি সে খোকাকে টপ্ করে আলসেতে ফেলে দিয়ে টিকটিকির রূপ ধরে সড়সড় করে ছাতে উঠে গেল। তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে-আস্তে তার মায়ের কাছে শুইয়ে রেখে এক লাফ মেরে ছাতে



গিয়ে দেখি আমার ছেলে নিচুয়া চিৎকার করে বলছে, 'বাবা, অন্ধকারে তুমি এই জানোয়ারকে চিনতে পারনি? ও আমাদের চিরকালের শত্রু। সেই চুটুপালু বনের দু-মুখো রাক্ষস, এখন বেড়ালের রূপ ধরে শহরে উৎপাত করতে এসেছে।' নিচুয়ার কথা শুনে রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি আমার লাঠির কানে-কানে বললুম, 'লাঠিভায়া, দুষ্টু রাক্ষসকে একবার তোমার তাল-বেতালি কারদানিটা বেশ ভালো করে দেখিয়ে চট্ করে আমার হাতে ফিরে এস।' লাঠি অমনি আমার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে দু-চারটে ডিগবাজি খেয়ে তাল ঠুকে রাক্ষসের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিচুয়াকে এক ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে যেমনি রাক্ষসের চার-দিকে ঘুরতে আরম্ভ করলে, অমনি তার মাথা দিয়ে লাল-নীল-সবুজ রঙের আগুন দপদপিয়ে জ্বলে উঠল। এই রকমে রাক্ষসের চারদিকে একটা আগুনের বেড়া-জাল সৃষ্টি করে তার পালাবার পথ একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সে রাক্ষসকে নাস্তানাবুদ করে তুললে। আর

খানিকটা সময় পেলে রাক্ষসকে পুড়িয়ে ছাই করে আকাশে উড়িয়ে দিত, কিন্তু ঠিক সেই সময় হল কি দৈবাৎ লাঠির গায়ে একগাছা ঘুড়ির সুতো জড়িয়ে গেল। বেচারা ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছাতের মাঝে উল্টে পড়ে চিৎকার করতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার পায়ে-জড়ানো সুতো খুলে দিচ্ছি, এই সুযোগে রাক্ষস নিচুয়াকে বগলদাবা করে এক লাফ মেরে তোমা-দের তেঁতুলগাছের উপর পড়ল—তারপর সেখান থেকে বিকট রকম চিৎকার করে হাসতে-হাসতে আরেক লাফে গঙ্গা পার হয়ে কোন দিকে যে চলে গেল—আমি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, তাকে আর ধরতে পারলুম না।"

ভোঁদড়দাদার কথা শুনে আমি বললুম, 'কি সর্বনাশ! এত বড় কলকাতা শহরের ভিতর রাক্ষসের উপদ্রব? এ রকম কথা আগে তো কখনো শোনা যায়নি। এখুনি টেলিফোনে পুলিসের বড় সাহেবকে একটা খবর দিলে হয় না?"

বুড়ো ঘাড় নেড়ে বললে, "না, পুলিসে-ফুলিসে খবর

দেবার দরকার নেই। তারা সামান্য একটা চোর ধরতে পারে না, রাক্ষসকে ধরবে কি করে ? আমার সেনাপতিকে খবর পাঠিয়েছি, সে এখুনি আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছাতে হাজির হবে। আজ রাত্তিরেই রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব স্থির করেছি।"

আমি বললুম, "আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো—তোমার দলবল সব হাজির হলে আমাকে একটা খবর দিও।"

ভোঁদড়দা আমার কথায় খুব খুশি হয়ে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কি মনে করে আবার চেয়ারে বসে বললে, "ভায়া, বড় একটা ভুল হয়ে গেছে, তোমার পরম বন্ধু বুদ্ধিমন্ত খরগোশকে খবর পাঠাতে ভুলে গেছি—এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল দাও দেখি, তাকে একখানা চিঠি লিখে দিই।"

আমার লেখার বাক্স থেকে কাগজ আর ফাউন্টেন পেন বার করে তার হাতে দিলুম।

বুড়ো ফসফস করে একখানা চিঠি লিখে তার তাল-বেতাল-সিদ্ধ লাঠির হাতে দিয়ে বলল, "চিঠিখানা শিগগির

বুদ্ধিমন্তের বাড়ি নিয়ে যাও, তার সঙ্গে দেখা করে বলবে, পত্রপাঠ তার দলবল নিয়ে এখুনি যেন ছাতে হাজির হয়। আর ফেরবার পথে বেড়ালদের পাড়ায় একটা খবর দিয়ে এস।" লাঠি চিঠি নিয়ে তেতলার জানালা দিয়ে লাফ মেরে একতলায় পড়ে লাফাতে-লাফাতে ফটক পার হয়ে কোনদিকে চলে গেল।

আমি লাঠির কাণ্ডকারখানা দেখে আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলুম, "ভোঁদড়দা, এরকম অদ্ভুত রকমের লাঠি কোথা থেকে যোগাড় করলে ?"

বুড়ো চৌকি ছেড়ে উঠে বললে, "ভায়া, লাঠির বিবরণ এখন আরম্ভ করলে রাত কাবার হয়ে যাবে। লড়াই থেকে ফিরে এসে তোমায় লাঠির ইতিহাস একদিন ধীরে-সুস্থে শুনিয়ে যাব।"

এই বলে বুড়ো চৌতলার ছাতে চলে গেল।

সে রাত্রিতে আমার আর ঘুম হল না, হাতে-মুখে একটু জল দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চৌকিতে বসে ঢুলতে লাগলুম।



এমন সময় পাড়ার মল্লিকবাবুদের বাড়ির পাঁচতলার উপরের সেই পাগলা ঘড়িটা তার এক চোখ লাল করে, কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে ঢং-ঢং-ঢঙা-ঢং করে বিশ-পঁচিশটা বাজিয়ে দিয়ে ভালো মানুষটির মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে আমার সামনের বড় আয়নার ভিতর থেকে মোটা-সোটা হ্যাট-কোট-পরা একটা কুকুর, একটা লাল কাঠের ঘোড়ায় চড়ে, টগবগ করে বেরিয়ে আমার সামনে এসে রাশ টেনে তার ঘোড়া থামাল। তারপর মিলিটারি কায়দায় মস্ত এক সেলাম করে বললে, "আমার নাম বকমল, আমি ভোঁদড় মহারাজের প্রধান সেনাপতি। মহারাজের সৈন্যসামন্ত হাজির। তিনি আপনাকে খবর দিতে বললেন।"

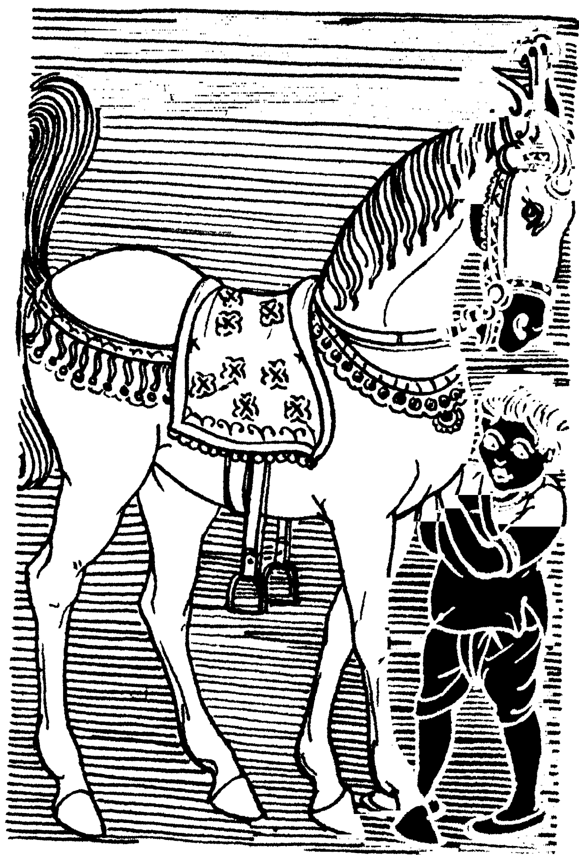
এই বলে বকমল-সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে আবার আয়নার ভিতর দিয়ে কোথায় চলে গেল।

আমি অন্ধকারে সিঁড়ি ভেঙে হাঁপাতে-হাঁপাতে চৌতলার ছাতে গিয়ে দেখলুম, হাজার-হাজার ভোঁদড়, বড়-বড় কেঁদো বেড়াল, নানারকমের খরগোশ আর

কাঠবেড়ালীতে আমাদের ছাত একেবারে ভরে গেছে। সকলেরই সিপাইদের মতো সাজ, লাল রঙের ইজের কোর্তা পরা, মাথায় নানা রকম রঙের পাগড়ী, কেউ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে, কারও হাতে তীর-ধনুক, আবার কেউ বা লাঠি-সোটা নিয়ে কাতারে-কাতারে চুপ করে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি বকমল-সাহেব তার ঘোড়ায় চড়ে ছাতময় ছুটোছুটি করে তার সৈনিকদের তদারক করে বেড়াচ্ছে।

ভোঁদড়দাদা আমায় দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললে, "ঐ দেখ, তোমার ছোটবেলাকার টাট্টু ঘোড়াকে আনিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখেছি। তুমি তো হাঁটতে পারবে না, ওর পিঠে চড়ে গেলে তোমার কোনো কষ্ট হবে না।"

এতকাল জানতুম, আমার সেই ছেলেবেলাকার টাট্টু ঘোড়া কোন কালে মরে ভূত হয়ে গেছে, কিন্তু আজ তাকে হঠাৎ ছাতের মাঝখানে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলুতে লাগলুম। এক মাথা পাকা চুল নিয়ে বুড়ো বয়েসে ওর পিঠে চড়তে



কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে সেকালের কথা ভাবতে লাগলুম।

ভোঁদড়দা আমার মনের ভাব বুঝে আমার কাছে এসে বললে, "কি ভায়া, বুড়ো বয়েসে খোলা ঘোড়ায় চড়তে লজ্জা হচ্ছে? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

এই বলে বুড়ো তার মখমলের কোটের পকেট থেকে একটা চমৎকার সোনার ডিবে বার করলে, তারপর তার ভিতর থেকে ডুমুরের মতো কি একটা ফল নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও একটা বিজলে-বউল, বেশ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেল, তারপর দেখা যাবে কি হয়।"

বিজলে-বউল যেমনি মুখে দেওয়া, আর অমনি দেখতে-দেখতে আমি পাঁচ বছরের ছেলে হয়ে পড়লুম!

ভোঁদড়দাদা পকেট থেকে একটা আয়না বার করে আমার সামনে ধরলে। তাতে দেখলুম, আমার সমস্ত পাকা চুল কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। মাথার টাকটা যে কোথায় পালিয়েছে তার ঠিক নেই। আমার কামিজটা

মেমেদের ঘাঘরার মতো আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে, আর তার আস্তিন দুটো পাখির ডানার মতো আমার কাঁধের দুদিকে হাওয়ায় উড়ছে। পায়ের তালতলার চটি জোড়া এত বড় হয়ে গেছে যে, তাতে করে অনায়াসে গঙ্গা পার হতে পারি। আমি এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে হতবুদ্ধি হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ভোঁদড়দাদা আমার হাত ধরে বললে, "আর, আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলে কি হবে? এখন চল, আমার বাড়িতে, তোমার কাপড় বদলে আনিগে। আমার কাপড় তোমার গায়ে এখন ঠিক হবে।"

ভোঁদড়দাদার সঙ্গে ভাঙা পিল্‌পের ভিতর দিয়ে অনেকখানি নেমে গিয়ে তার বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এ রকম আগে কখনো দেখিনি। ঘোর নীল রঙের চকচকে চীনা মাটির সাত মহলা বাড়ি—চারদিকে মস্ত বাগান, তাতে নানা রকম রঙিন কাগজের গাছে কত রকমের শোলার ফুল যে ফুটেছে তার ঠিকানা নেই। খিড়কির পুকুরে এক পাল চীনেমাটির রাজহাঁস সাঁতার



কেটে খেলে বেড়াচ্ছিল। আর রাজবাড়ির ফটকে খাড়া পাহারা দিচ্ছিল—টিনের বন্দুক ঘাড়ে রঙ-করা কাঠের সেপাইরা। আমাদের দেখে একজন সেপাই ছুটে বাড়ির সদর দরজা খুলে দিয়ে সেলাম করে সরে দাঁড়াল।

ভোঁদড়দাদা আমায় একটা আয়না-মোড়া ঘরে নিয়ে গিয়ে আলমারি থেকে ভালো-ভালো পোশাক বার করে আমায় সাজিয়ে দিলে। কোমরে একটা চকচকে তলোয়ার গুঁজে দিয়ে বললে, "এইবার চল, গিন্নির কাছে বিদায় নিয়ে আসিগে।"

একটা খুব সাজানো ঘরে গিয়ে দেখলুম ভোঁদড় গিন্নি সোনার পালঙ্কে উবুড় হয়ে পড়ে কাঁদছেন আর তাঁর দুই মেয়ে উমনো আর ঝুমনো তাঁর শিয়রে বসে পাখা করছে।

আমি ভোঁদড়গিন্নির কাছে গিয়ে বললুম, "বৌঠাকরুণ, তোমার কোনো ভয় নেই। চেয়ে দেখ, আমরা সেজে-গুজে রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি—নিশ্চয় রাক্ষস ধরা পড়বে, এখন তুমি হাসি মুখে আমাদের বিদায় দিলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা করতে পারি।"

ভোঁদড়গিন্নি আমার কথায় মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে বসে বললেন, "একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে, কত কাল পরে আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছ, একটু কিছু মুখে না-দিয়ে গেলে লোকে কি বলবে? মহারাজ, তুমিও একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও।"

ভোঁদড়দা গিন্নির কাছে বসে বললে, "এখন তো খাওয়া-দাওয়া করবার সময় নয়, তা ছাড়া তুমি বোধহয় জানো না যে আমি রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করেছি রাক্ষসকে বধ না-করে জলস্পর্শ করব না।"

গিন্নি তখন তাঁর সোনার বাটা থেকে কতকগুলো তবকমোড়া পান বার করে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, "তবে এখন এস, কিন্তু নিচুয়া ফিরে এলে একদিন ধুমধাম করে এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, মনে থাকে যেন।"

আমরা পান চিবুতে-চিবুতে রাজবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে প্রকাণ্ড এক অজগর সাপের খোলকে প্রণাম করে দুখানা আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়ালুম—রাজ-পুরোহিত ইঁদুরমহাশয় সবুজ চেলীর জোড় পরে, সোনার





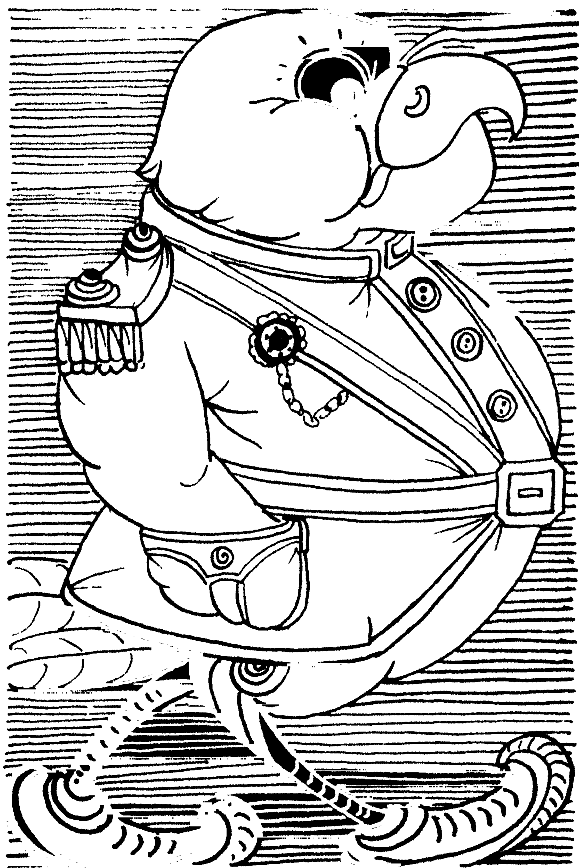
থালায় ধান দূর্বা নিয়ে খুব ঘটা করে আমাদের আশীর্বাদ করে, হাত জোড় করে আমাদের সামনে তাঁর ল্যাজ নাড়তে লাগলেন। চাপকান-চোগা-পরা দেওয়ানজী নেংটি-বাহাদুর ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমাদের হাতে গোটা দুই করে আকবরি বাদাম গুঁজে দিয়ে ফিসফিস করে বলে দিলেন, "পুরোহিত মহাশয়ের প্রণামী।" আমরা সেই পচা বাদাম দিয়ে পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই কোথা থেকে বেঁজি-আচার্যি ছুটে এসে এক জোড়া মরা ব্যাঙ আমাদের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে, "মরা ব্যাঙ যাত্রা কালে বড়ই শুভ লক্ষণ, অতএব মহারাজরা একটিবার এইদিকে দৃষ্টি-পাত করুন, পথে কোনো অমঙ্গল হবে না।" আচার্য পেলেন রামচন্দ্রের আমলের এক টুকরো পনীর।

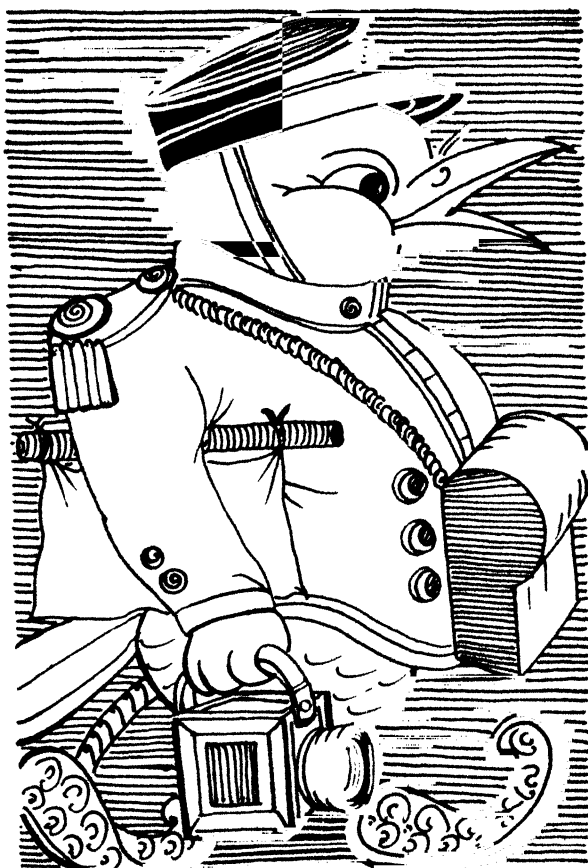
ছাতে এসে এইবার ঘোড়ায় উঠলুম। ভোঁদড়দাদা কিংখাবের সাজ পরানো এক শাদা রামছাগলে চড়ে রাজচ্ছত্র মাথায় দিয়ে, ঝমঝম করে আমার পাশে এসে ভোঁ-ভোঁ করে ভেঁপু বাজিয়ে দিলে।

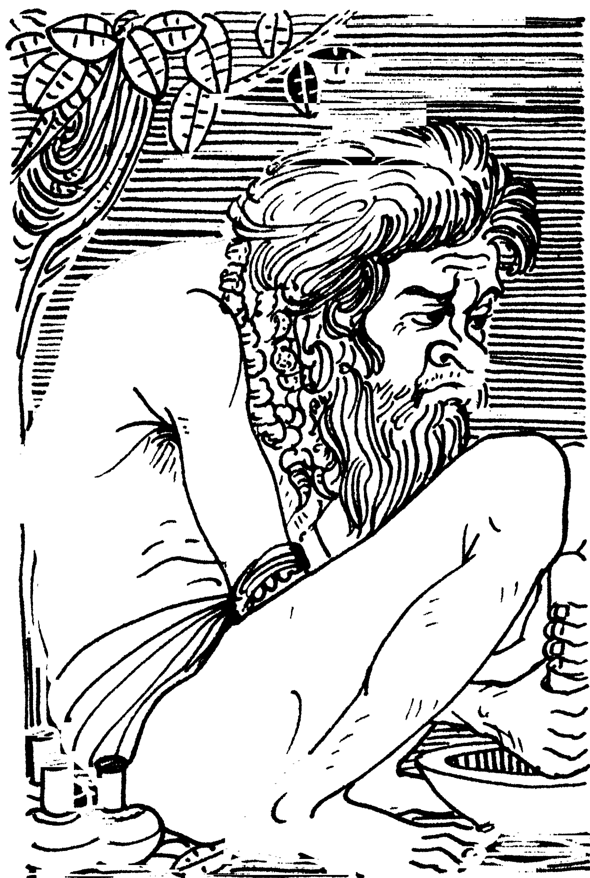
সেনাপতি সাহেব তার ঘোড়া ছুটিয়ে ছাতের মাঝখানে গিয়ে একটা মস্ত পাঁচরঙা নিশেন নেড়ে চিৎকার করে হুকুম দিলে, "মার্চ।" অমনি চারদিক থেকে কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে লাগল। মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে হুলু-ধ্বনি করলে, আগে-আগে কাঠ-বেড়ালীর দল ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চলল, তারপর খরগোশের দল তীর-ধনুক নিয়ে চলল, তার পিছনে লাঠি-সোঁটা নিয়ে এক দল কুনো বেড়াল মার্চ করে চলে গেল। সব শেষে আমরা। ভোঁদড় সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাজনার তালে-তালে "আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে· ঢাল মৃদং ঝাঁঝর বাজে" এই জাতীয়-সঙ্গীতটি গাইতে-গাইতে কত রাস্তা, ঘাট, মাঠ পার হয়ে এসে একেবারে সেই কমলাপুলির ইস্টিশানে এসে পড়লুম।

স্টেশনমাস্টার টিয়ে-সাহেব, গার্ড টুনটুনি-সাহেব আর টিকিট-বাবুইরা সকলেই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমরা কাউকে কিছু না-বলে কুইক্ মার্চ করে প্ল্যাটফরমে এসে ঢোকামাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল।









বুদ্ধিমন্ত গম্ভীরমুখে ভোঁদড়দাদার কাছে এসে বললে, "মহারাজ, অদ্য আমাদের ট্রেন মিস হইয়াছে।"

এই নিদারুণ সংবাদে আমরা সকলে মাথায় হাত দিয়ে প্ল্যাটফরমে বসে পড়লুম।

কুনো-বেড়ালের দল "বাবা গো, মা গো, কি হল গো" করে কান্না জুড়ে দিলে, সেনাপতি-সাহেব ব্যতিব্যস্ত হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

এক দল চীনে-সাহেব প্ল্যাটফরমের নিচে ঠুক-ঠাক করে কি মেরামত করছিল। বুদ্ধিমন্ত তাদের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি বকাবকি করলে তার একটা কথাও আমরা বুঝতে পারলুম না, তারপর দেওয়ানজীকে ডাকিয়ে তাদের সকলের হাতে এক মুঠো করে মোহর গুঁজে দিতে তখন চীনে-সাহেবেরা ছুটে গিয়ে কারখানা-ঘর থেকে কতকগুলো লোহার চাকা গড়িয়ে এনে প্ল্যাটফরমের দুদিকে দড়াদড়ি বেঁধে বড়-বড় পেরেক ঠুকে, স্ক্রু কষে দিয়ে বললে, "সব ঠিক হো গিয়া। যাও, অব্ ঘন্টি মারো।"

বুদ্ধিমন্ত ছুটে গিয়ে ইস্টিশানের লোহার ঘণ্টা ঢং-ঢং

করে বাজিয়ে একটা সবুজ রঙের নিশান নাড়তে লাগল।

কমলাপুলির প্ল্যাটফরম এতক্ষণ মড়ার মতো লম্বা হয়ে পড়ে ছিল, ঘণ্টার আওয়াজ পেয়ে ধড়ফড় করে জেগে উঠে গড়গড় করে ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে পড়ে ভয়ানক রকম তর্জন-গর্জন করে যুগ-যুগান্তর ছুটে চলল। আমরা যে যার বিছানা পেতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলুম। দুদিকে কত ফুলের বাগান, কত ধানের আর পাটের খেত, পাহাড়-পর্বত—কত কি দেখতে-দেখতে চলেছি।

সুয্যিমামা ঠিক সেই সময় দিনের খাটুনির পর এক ধাপ এক ধাপ করে মেঘের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি যাচ্ছিলেন। আমাদের প্ল্যাটফরমের ভীষণ গর্জন তাঁর কানে গেল, নিচের দিকে চেয়ে মনে করলেন, বুঝি একটা অজগর সাপ তাঁকে গিলতে আসছে। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল—তাড়াতাড়ি একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে একখানা কালো মেঘের কম্বল মুড়ি দিয়ে ফুস করে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। চারদিকে অমনি অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

সেই ঘুরঘুটি অন্ধকারে আমরা প্ল্যাটফরমে চড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে একটা নিবিড় শালবনের ভিতর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছি। প্ল্যাট-ফরমের যাওয়ার শেষ নেই—কোথায় যে যাচ্ছি, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

এমন সময় হল কি, দৈবাতে একটা প্রকাণ্ড বেগুন গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কমলাপুলির প্ল্যাটফরম চুরমার হয়ে গেল! আমাদের সৈন্যসামন্ত কে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, আজ অবধি তার খোঁজ কেউ দিতে পারলে না।

ভোঁদড়দাদা, আমি আর বুদ্ধিমন্ত, আদিম যুগের প্রকাণ্ড এক মহা-বটগাছের তলায় ছিটকে পড়েছিলুম। তাড়াতাড়ি গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দেখলুম, বটতলার আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ো মস্ত একটা উইমাটির ঢিপির উপর বসে কষ্টিপাথরের খলে ওষুধ মাড়ছে—তার চারদিকে সাজানো রয়েছে ছোটা-বড় নানা রকম রঙের ফঁুকোশিশি, কতরকমের ফলফুল আর একরাশ শুকনো-পাতা। বট গাছের ঝোরা থেকে ঝুলছিল মেলা সোনা-রুপোর নিক্তি।৮

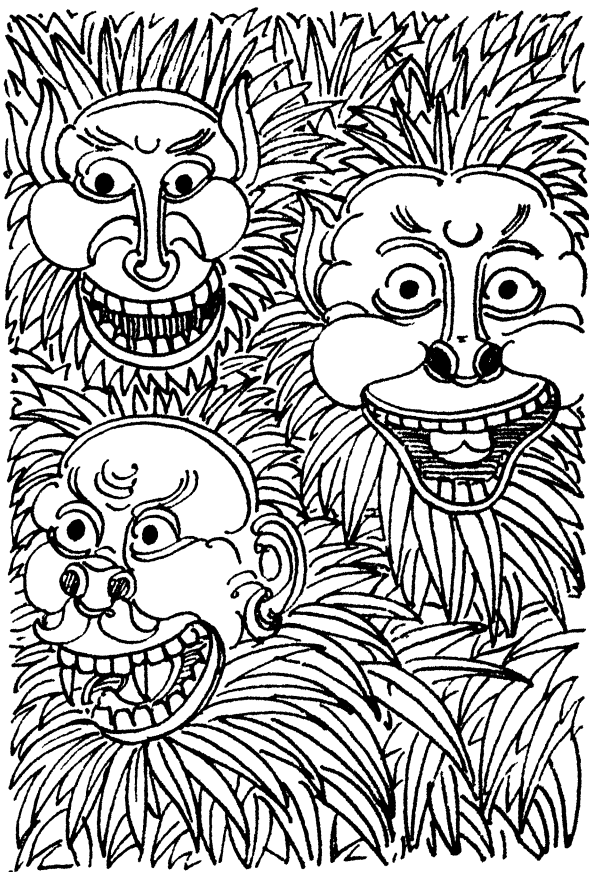
আমরা বণ্ডিবুড়োকে প্রণাম করে জিগগেস করলুম, "মশাই, দু-মুখো রাক্ষস কোন বনে থাকে, বলে দিতে পারেন ?"

বণ্ডিবুড়ো বললে, "রাক্ষস এই বনেই তো থাকে, কিন্তু আজ কদিন তার হাঁকডাক বড় একটা শুনতে পাই না। তোমরা আমার নাতনী জোটেবুড়ির কাছে গেলে রাক্ষসের সব খবর জানতে পারবে।"

আমরা জিগগেস করলুম, "জোটেবুড়িমার বাড়ি কোথায় ?"

বুড়ো বললে, "সে যে কখন কোথায় থাকে তার কিছুই ঠিক নেই। তোমরা পুবমুখো সোজা চলে যাও--এখান থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের ধারে মস্ত একটা নীল পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের চুড়োর উপরে একটা পান্নার গাছে মানিকের ফুল ফুটে আছে দেখতে পাবে। ঠিক সেই গাছতলায় জোটেবুড়ির বাড়ির সোনার দরজা আছে।"

বণ্ডিবুড়ো এই বলে তার ঝোলার ভিতর থেকে মস্ত একটা সোনার চাবি বার করে আমার হাতে দিয়ে



বললে, "এই নাও সেই দরজার চাবি, ভালো করে রেখে দাও। সেদিন বুড়ি কি জানি কার জন্যে আমার কাছে ওষুধ নিতে এসে চাবিটা এখানে ফেলে গেছে। আর এই নাও এক মোড়ক শঙ্কাহরণ বটিকা, পাঁচটা পাকা হরীতকী, দুটো ডুমুরের ফুল, আর আধ সের স্বাতী নক্ষত্রের জল দিয়ে এই খলে বেশ করে মেড়ে সকলে মিলে খেয়ে ফেল। এই বনে অনেক রাক্ষস বাস করে, তারা আর তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না।"

আমরা কোনো রকমে সেই ভয়ানক তেতো ওষুধ খেয়ে পুবমুখো চলতে লাগলুম।

বনের ঝোপ-ঝাপের আড়াল থেকে বিকট আকার রাক্ষসেরা উঁকিঝুঁকি মেরে চিৎকার করতে লাগল, "হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ," কিন্তু তারা আর আমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করলে না।

নিবিড় বন পার হয়ে একটা তেপান্তর মাঠ ভেঙে চলতে-চলতে এক পাগলা-রাজার বাগানের সামনে এসে

দেখলুম, সিংহীর মামা ভোম্বলদাস গণ্ডা দশ বাঘ মেরে রাস্তার ধারে হাড় চিবুচ্ছে—আমাদের দেখতে পেয়ে হালুম-হালুম করে বললে, "এক কাহন সোনা না দিলে এদিক দিয়ে যেতে পারবে না।"

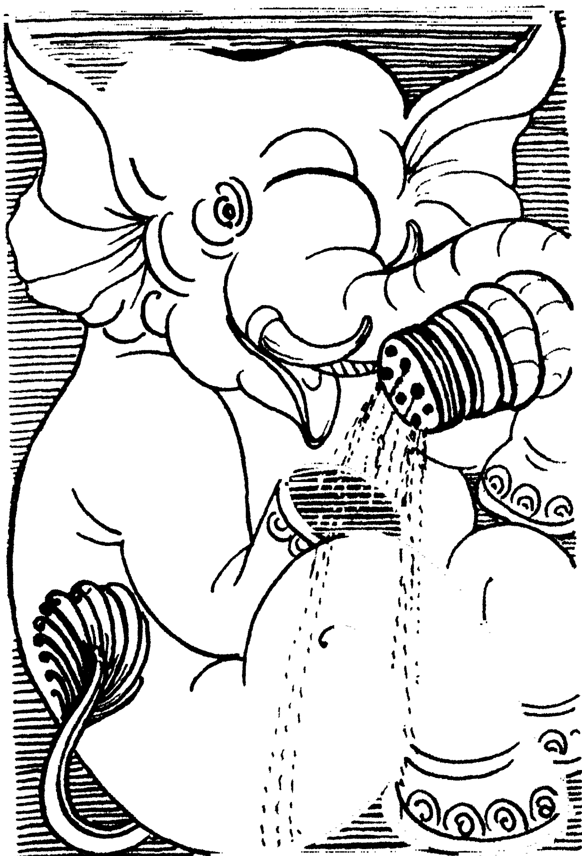
আমরা পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, আমাদের একটা কানাকড়িও নেই— কমলাপুলিতে পকেট-কাটারা পকেট কেটে নিয়েছে।

এক পাল রাজহাঁস বুক ফুলিয়ে ঘাড় নেড়ে-নেড়ে সেই দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল, তাদের কাছে গিয়ে বললুম, "এক কাহন সোনা ধার দিতে পার ?"

তারা প্যাঁক-প্যাঁক করে বললে, "আমাদের এখন বিরক্ত কর না, আমরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি।"

দূরে কলা বনে বীর হনুমান চক্ষু মুদে কার ধ্যান করছিলেন। তাঁর কাছে এক কাহন সোনা চাইতে বললেন, "আমি টাকাকড়ির বড় একটা ধার ধারিনে। তোমরা হাতি-খুড়োর কাছে যাও, তার অনেক সোনা-দানা জমা আছে।"

হাতি-খুড়ো সবে পুকুরে চান করে একটা বটগাছের



তলায় বসে গায়ে পাউডার মাখছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে চাইতে এক কাহন সোনাদানা বার করে তিনি আমাদের দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কোথা থেকে ভোঁ-ভোঁ করে মোটরকারের ভেঁপুর আওয়াজ শোনা গেল।

আমরা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, একটা টকটকে লাল রঙের মোটর হেড-লাইট জ্বেলে ভয়ানক রকম ধুলো উড়িয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসছে।

হাতি-খুড়ো ভয়ে থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে আবার পুকুরে পড়ে শুঁড় দিয়ে চারদিকে জল ছিটুতে আরম্ভ করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি রাস্তার নালার ভিতর লাফিয়ে পড়লুম।

মোটরখানা সোঁ করে আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বনবন্ করে আম-বাগানের চারদিকে ঘুরে, পাগলা-রাজার বাড়ির ফটকের আধখানা উড়িয়ে দিয়ে, এঁকে-বেঁকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। কমলাপুলির স্টেশনমাস্টার টিয়ে-সাহেব, গার্ড টুনটুনি-সাহেব আর দুজন পাহারাওয়ালা একে-একে টপ-টপ করে নেমে আমাকে ঘেরাও করে দাঁড়াল।

টিয়ে-সাহেব আমার কাছে এসে হঠাৎ আমার ঘাড় ধরে হুকুম দিলে, "এই দুষ্টু ছেলেটাকে থানায় নিয়ে যাও।"

একজন ভুঁড়িদার ওস্তাদ পাহারাওয়ালা এগিয়ে এসে আমার পেটে রুলের গুঁতো মেরে ফস করে আমার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দিলে।

আমি সাহেবকে বললুম, "সাহেব, আমায় শুধু-শুধু থানায় নিয়ে যাচ্ছ কেন, আমি তো কিছুই করিনি।"

টিয়ে-সাহেব ভয়ানক রেগে লালমোহনের রূপ ধারণ করলে। চিৎকার করে বললে, "ফের মিথ্যা কথা! কাল রাত্তিরে কমলাপুলির প্ল্যাটফরম চুরি করে এনে ঐ বেগুনবনে চুরমার করে ভাঙলে কে? তোমার নামলেখা একখানা রুমাল ইটের গাদা থেকে পাওয়া গেল কী করে?"

টিয়ে-সাহেবের সামনে এসে বুদ্ধিমন্ত বলতে লাগল, "এই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী ভোঁদড়-মহারাজের কুমার-বাহাদুরকে চুটুপালু বনের যুগানন রাক্ষস হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তদ্দর্শনে সৈন্য-সামন্ত লইয়া



রাক্ষসের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিতেছিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে—"

ভোঁদড়দাদা এক ধমক দিয়ে বুদ্ধিমন্তকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "ক্ষান্ত হও বুদ্ধিমন্ত, সামান্য একটা টিয়েপাখিকে অত সাধু ভাষায় কৈফিয়ৎ দেবার কিছু দরকার দেখছিনে। ওকে ধরে হাতির পায়ের তলায় ফেলে দাওগে, ওর প্ল্যাটফরমের দাম চুকিয়ে দেবে।"

ভোঁদড়দাদার দাঁড়াবার কায়দা, আর তার গলায় গজমোতি-হারের বাহার দেখে টিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা সবুজ হয়ে তাড়াতাড়ি আমার হাতের হাতকড়ি খুলে দিয়ে ভোঁদড়দাদাকে সেলাম করে বললে, "মহারাজ-বাহাদুর, আমাকে মাপ কর, আমি না-বুঝে তোমাদের অপমান করেছি। কিছুদিন আগে আমারও একটি ছেলে হারিয়েছে, পুলিসে খবর দিয়েছিলুম, কিন্তু তারা কিছু করতে পারেনি।"

ভোঁদড়দাদা বললে, "সাহেব, চল তুমি আমাদের জোটেবুড়িমার বাড়ি, সেখানে গেলে তোমার ছেলের সঠিক খবর পাওয়া যাবে।"

টিয়ে-সাহেব তার গার্ড আর পাহারাওয়ালাদের কমলা-পুলিতে ফিরে যেতে হুকুম দিয়ে বললে, "তা হলে চলুন, মহারাজ, আমার মোটরেই যাওয়া যাক, এখানে আর দেরি করে কি হবে ?"

টিয়ে-সাহেবের কাছে গিয়ে বুদ্ধিমন্ত বললে, "সাহেব, তুমি তো বললে চলুন, কিন্তু যাই কি করে ? দেখছ না; ওদিকে কে আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ?"

সিংহীর মামাকে দেখে টিয়ে-সাহেব তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চকচকে পিস্তল বার করে দুমদাম আওয়াজ বার করতে লাগল। কিন্তু মামা সব বন্দুকের গুলি হজম করে, চার চক্ষু রক্তবর্ণ করে, সাহেবের দিকে আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে দেখে বুদ্ধিমন্ত ছুটে-ছুটে সাহেবের কাছে গিয়ে বললে, "সাহেব, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, দু-মুখো রাক্ষস মায়াবলে সিংহীর মামার রূপ ধারণ করে আমাদের পথ আটকেছে। বদ্দিবুড়োর ওষুধের গুণে আমাদের গায়ে হাত দিতে পারছে না, কিন্তু তোমায় এখুনি কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। এই নাও সেই ওষুধ, খানিকটা আমার কাছে ছিল,



শিগগির খেয়ে ফেল।" তারপর বুদ্ধিমন্ত করলে কি রাস্তা থেকে এক-মুঠো ধুলো-মাটি কুড়িয়ে নিয়ে মন্তর পড়ে যেমন মামার গায়ে ছিটিয়ে দিলে, আর রাক্ষুসে মায়া অমনি টুটে গেল, কোথা থেকে একটা ঘুরণী-হাওয়া এসে সিংহীর মামা ভোম্বলদাসকে ঘোরাতে-ঘোরাতে আকাশের কোনদিকে যে নিয়ে গেল তার ঠিক নেই।

আমরা তখন মোটরে চড়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে-যেতে নীল পাহাড়ের চুড়োর উপর সেই পান্নার গাছতলায় এসে পড়লুম।

মোটর থেকে নেমে সকলে মিলে পান্নার গাছতলায় সোনার দরজা খুঁজতে লাগলুম। কিন্তু সেখানে দরজার কোনো চিহ্নমাত্র দেখতে পেলুম না। খালি দেখলুম দুটো তালপাতার সেপাই গাছের ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে বন্‌বন্‌ করে তালপাতার রঙ-করা ঢাল-তলোয়ার ঘোরাচ্ছে। এত জোরে তলোয়ার ঘোরাচ্ছিল যে, আমরা কেউ তাদের কাছে যেতে সাহস করলুম না, মনে কেমন ভয় হতে লাগল।

টিয়ে-সাহেব মস্ত একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে তাদের

ছুঁড়ে মারলে, কিন্তু পাথরটা তালপাতার সেপাইয়ের ঢালে ঠিকরে এসে সাহেবেরই কপালে লাগল, বেচারার কপাল ফুলে ঢোল হয়ে উঠল।

টিয়ে-সাহেব ভয়ানক রেগে গিয়ে বললে, "আমার কাছে খানিকটা বারুদ আছে। তোমরা সকলে যদি অনুমতি দাও, তাহলে বারুদ দিয়ে এই তালপাতার সেপাইদের এখান থেকে উড়িয়ে দিতে পারি! কত বড়-বড় পাহাড় উড়িয়ে দিয়েছি, আর সামান্য দুটো তালপাতার সেপাই উড়িয়ে দিতে পারব না?"

এমন সময় একটা ল্যাজ-ফুলো শেয়াল ঢোল বাজিয়ে নাচতে-নাচতে আমাদের কাছে এসে বললে, "তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছ কি?"

টিয়ে-সাহেব বুক ফুলিয়ে বললে, "ভাবছি, তাল-পাতার সেপাই দুটোকে বারুদ দিয়ে এখান থেকে উড়িয়ে দেব।"

শেয়াল হো-হো করে হেসে উঠে বললে, "তোমাদের সাধ্য কি যে ওদের এখান থেকে নড়াতে পার! ওরা কতকাল ধরে ঠিক ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে ঢাল-তরোয়াল





ঘোরাচ্ছে, তার ঠিক নেই! আমার ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলুম, অনেকদিন আগে ঐ বনের রাক্ষসরা ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল, কিন্তু কেউ ওদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। তাঁর কাছে শুনেছি, ময় নামে এক দানব এই তালপাতার সেপাই দুটোকে তৈরি করে এইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছেন।"

শেয়ালের কথা শুনে আমরা গালে হাত দিয়ে একটা পাথরের উপর বসে ভাবতে লাগলাম, কি করা যায়।

ভোঁদড়দাদা মুখ শুকিয়ে কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, "এত কষ্ট করে, সৈন্যসামন্ত সব হারিয়ে, এত দূরে এসে শেষে কি শুধু হাতে বাড়ি ফিরতে হবে? তোমাদের যাদের ইচ্ছে হয়, ফিরে যাও, আমি ঐ সমুদ্রের ধারে তুষানলে প্রাণত্যাগ করব স্থির করলুম।" তারপর বুদ্ধিমন্তর কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বললে, "বুদ্ধিমন্ত, তোমার প্রভুর এই শেষ কাজটার বন্দোবস্ত করে দিলে সুখে মরতে পারি।"

তারপর আমার কাছে এসে ভোঁদড়দাদা বললে, "ভায়া, আমি মরবার পর আমার মাথায় যে দুটো

সাপের মাথার মণি দেখছ, ও দুটো উমনো আর ঝুমনোকে দিও, আর এই গজমোতির হারছড়াটা গিন্নিকে দিয়ে বোলো—" এইটুকু বলে ভোঁদড়দাদা আর কথা বলতে পারল না, মুখে রুমাল দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

আমি বুদ্ধিমন্তর কাছে গিয়ে বললুম, "এস, সকলে মিলে এক সঙ্গে তুষানলে প্রাণত্যাগ করা যাক। বাড়ি ফিরে আবার বড়-বড় পণ্ডিতমশাইদের হাতে পড়ার চেয়ে প্রাণত্যাগ করা ঢের ভালো মনে করছি।"

বুদ্ধিমন্ত আমার কথা শুনে বললে, "আমি তো ভাই মরেই আছি, আমার বাঁচা-মরা দুই-ই সমান। কোনদিন শেয়াল ভায়াদের হাতে পড়ে প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে এক সঙ্গে প্রাণত্যাগ করা খুবই ভালো মনে করি। টিয়ে-সাহেব তুমি কি করবে?"

সাহেব বুক ফুলিয়ে বললে, "আমি মরতে ভয় করিনে। কিন্তু পুড়ে মরতে পারব না, কারণ সেটা আমাদের ধর্ম নয়। আমার এই পিস্তলের গুলি খেয়ে আমি মরতে রাজী আছি।"

এই কথা বলে সাহেব বুদ্ধিমন্তর হাতে পিস্তলটা

দিয়ে একটু দূরে গিয়ে একটা পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, তারপর পকেট থেকে একটা লালরঙের রুমাল বার করে নিজের দুই চোখ বেশ করে বেঁধে চিৎকার করে বললে, "আমি প্রস্তুত! তাক করে ঠিক আমার বুকে মারো।"

শেয়াল-ভায়া আমাদের সকলের রকম-সকম দেখে হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, "আচ্ছা, তোমরা প্রাণত্যাগ করবার জন্য হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন বুঝতে পারছিনে। আগে আমি কি বলি শোনো, তারপর যা ইচ্ছা হয় তাই কর।"

এই বলে শেয়াল আমাদের সামনে একটা পাথরের উপর বসে বলতে লাগল, "আমাকে প্রায় রোজ রাত্তিরে এই জায়গাটা দিয়ে আনাগোনা করতে হয়। সেদিন রাত্তিরে আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তখন রাত প্রায় চার প্রহর হবে। এই জায়গাটায় আসবামাত্র সেদিন আমার গা কেমন ছমছম করে উঠল। এরকম ছমছমে ভাব আগে আমার কখনো হয়নি। মনে করলুম, সকালে নাপিত-ভায়া আমায় কামাতে-

কামাতে আমার নাক কেটে দিয়েছিল, তাই বুঝি এমন গা ছমছম করছে। এমন সময় হঠাৎ দেখলুম, একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে সমস্ত পাহাড় আলো করে এইদিকে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি ঐ ঝোপের ভিতর লুকিয়ে দেখতে লাগলুম, এত রাত্তিরে সে এখানে এসে কি করে। মেয়েটি একটি শাদা বেড়াল কোলে করে তালপাতার সেপাইদের সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর বেড়ালের কানে-কানে কি বলে দিয়ে এই পান্নার গাছতলায় ছেড়ে দিলে। বেড়ালটা দুধের মতো শাদা, খালি তার কপালে ছিল একটি লাল দাগ। তোমরা যদি আমার কাটা নাক জোড়া দিতে পার, তাহলে আমি বলে দেব, বেড়াল তালপাতার সেপাইদের কি করে সরালে।"

ভোঁদড়দাদা রুমাল মুখে দিয়ে সব শুনছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে এক শিশি বিশল্য-করণীর আরক বার করে শিয়ালের নাকে লাগিয়ে দিলে, অমনি তার নাক বেমালুম জোড়া লেগে গেল।

শেয়াল তখন দু-হাত তুলে নাচতে-নাচতে বললে,



"তোমাদের মধ্যে যার কপালে রাজটিকা আছে, সে যদি পান্নার গাছে উঠে দুটো মানিক-ফুল পেড়ে এনে সেপাই দুটোর গায়ে ফেলে দেয়, তাহলে ওরা এখুনি এখান থেকে সরে যাবে।"

এই বলে শেয়াল ঢোল বাজিয়ে নাচতে-নাচতে নাপিত-ভায়ার বাড়ির দিকে চলে গেল।

বুদ্ধিমন্তর কপালে একটি লাল দাগ দেখতে পেয়ে আমি জিগগেস করলুম, "তোমার কপালে ওটা কিসের দাগ হে?"

বুদ্ধিমন্ত বললে, "অনেক কাল আগে আমি কুসুমবতী নগরীর অধিপতি ছিলুম। আমার চার মহিষী ছিল। জগদীশ্বর আমাকে নানা জনপদের অধীশ্বর করে অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিত-চিন্তার ভার দিয়েছিলেন।"

আমি বুদ্ধিমন্তর কাছে একটু সরে এসে বসে বললুম, "তারপর?"

বুদ্ধিমন্ত বলতে লাগল, "তারপর একদিন কি কুক্ষণে আমার মাথায় এক খেয়াল উদয় হল, আমার

প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে বললুম, 'মন্ত্রী, আমি সাহেনশা বাদশা হারুন-অল-রসিদের মতো ছদ্মবেশে আজ রাত্তিরে আমার নগরীতে কোথায় কি হচ্ছে দেখতে ইচ্ছা করি। তুমি, সেনাপতি আর নগরপাল ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে থাকবে। আমি রাত্তিরে আহারাদি করে আমার প্রমোদ-কাননে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব, সেইখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। এখন যাও তার সব বন্দোবস্ত করগে—দেখো, এ কথা কেউ যেন না-জানতে পারে।"

আমি বুদ্ধিমন্তর কাছে আরও একটু সরে বসে বললুম, "তারপর কি হল ?"

ভোঁদড়দাদা বিরক্ত হয়ে বললে, "ভায়া, এখন তারপরের আর সময় হবে না, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, প্রায় অন্ধকার হয়ে এল, বাড়ি ফিরে একদিন তোমায় খরগোশের কাহিনী শুনিয়ে দেব। এখন শেয়াল যা বলে গেল, এটা সত্যি কি মিথ্যে, একবার দেখা দরকার।"

টিয়ে-সাহেব খুব গম্ভীর হয়ে একটু মুচকে হেসে বললে, "মানিকের ফুল বাজারে বেচলে অনেক দাম

পাওয়া যাবে, কিন্তু তালপাতার সেপাইদের গায়ে ছুঁইয়ে দিলে ওরা যে এখান থেকে নড়বে, এ-কথা আমার বিশ্বাস হয় না।"

সাহেবের কথায় বুদ্ধিমন্ত ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, "তুমি এই বিংশ শতাব্দীর শুকপক্ষী হয়ে এমন কথা কি করে যে বললে, বুঝতে পারলুম না। আমাদের বাপ পিতামহরা কি কখনো বিশ্বাস করে ছিলেন যে, মানুষ জটায়ুপক্ষীর মতো আকাশে উড়তে পারবে—সামান্য একটা কাঁচের ভিতর দিয়ে মাছিকে হাতির মতো বড় করে তার হাজার-হাজার চোখ দেখতে পাবে—আর সেই একই কাঁচে চন্দ্র সূর্যকে ঘরের কাছে এনে তার ভিতরে কি আছে দেখে কেতাবে লিখে রাখবে—আজকাল ঘরে বসে সকলেই তো আকাশে কান পেতে দেশ-বিদেশের বড়-বড় গায়িয়ে বাজিয়েদের গান শুনচে—সেদিন এক মহাপুরুষের বাড়ি গিয়ে দেখলুম, তাঁর বাগানের গাছপালারা ভুষো মাখানো কাঁচে তাদের জীবনচরিত লিখছে। অতএব কিসে কি হয়, তা কি কেউ বলতে পারে?"

এই বলে বুদ্ধিমন্ত তরতর করে পান্নার গাছে উঠে পড়ল, দুটো মানিকের ফুল পেড়ে এনে যেই তালপাতার সেপাইদের গায়ে ফেলে দিলে, অমনি তারা এদিক-ওদিকে সরে গেল, আর সেই সোনার দরজা আমাদের সামনে বেরিয়ে পড়ল।

বদ্দিবুড়োর সোনার চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখলুম, প্রকাণ্ড একটা লাল পাথরের কুয়ো আর তার ভিতরে শাদা পাথরের সিঁড়ি ঘুরতে-ঘুরতে নেমে গেছে।

আমরা সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম। এক ধাপ নামতেই উপরের সোনার দরজা দড়াম করে আপনি বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়িতে কোনো রকম আলো ছিল না, কিন্তু কোথা থেকে যে একটা ঝাপসা আলো আসছিল বুঝতে পারলুম না। ঘুরতে-ঘুরতে অনেক দূর মাটির নিচে নেমে আবার উপরে উঠতে লাগলুম। এই রকম ওঠা-নামা করতে-করতে প্রকাণ্ড এক আকাশের মতো নীল ঘরে এসে মনে হল যেন আকাশের কোথায় এক জায়গায় এসে পড়েছি। সেই ঘরে জানলা, দরজা বা কোনো রকম আসবাবপত্র নেই, খালি ঘরের

ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড পান্নার বেদীর উপরে চমৎকার একটি ছোট মানিকের সিংহাসন, আর তার পাশে একটি পাখির দাঁড়।

আমরা বেদীর সিঁড়ির নিচের ধাপে বসে আছি, এমন সময় আমার কোলে টপ করে কি একটা পড়ল— সেটা হাতে নিয়ে দেখলুম, একটি সোনার কৌটো, কিন্তু কি করে যে সেটা খুলতে হয়, বুঝতে পারলুম না। সকলেই সেটা খুলতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারলে না। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, সিংহাসনের তলায় একটি শাদা বেড়াল গুড়িশুড়ি মেরে ঘুমোচ্ছে। ভোঁদড়দাদা তার কাছে গিয়ে অনেক ঠেলাঠেলি করে তাকে জাগিয়ে জিগগেস করলে, "ঘর থেকে কি করে বেরুব, তার সন্ধান বলে দে।"

বেড়াল হাই তুলে "ফুঁ দাও, ফুঁ দাও" করতে-করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আমরা ঘরের চারদিকে ফু দিয়ে বেড়াতে লাগলুম। ফুঁ দিতে-দিতে আমাদের চোয়াল ধরে গেল, তবুও ঘর থেকে বেরোবার কোনো পথ খুঁজে পাওয়া গেল না।

টিয়ে-সাহেব ভয়ানক বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে পিস্তল বার করে বেড়ালের কানের কাছে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগল। তখন বেড়াল ধড়মড়িয়ে উঠে বললে, "তোমরা আমার কাঁচা ঘুম ভাঙালে কেন? আমি রাক্ষসের দুটো জিভ খেয়ে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছিলুম।"

ভোঁদড়দাদা ভয়ানক চটে গিয়ে বললে, "তুই যে একটু আগে বললি, ঘরে ফুঁ দিতে—সেই অবধি ফুঁ দিয়ে-দিয়ে আমাদের দম বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে, কিন্তু কই, কিছুই তো হল না!"

বেড়াল এক গাল হাসি হেসে বললে, "ঘরের চারদিকে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে তোমাদের কে বললে? ঐ সিঁড়ির ধাপে বসে সোনার কৌটোয় একবার ফুঁ দিয়ে দেখ দেখি কি হয়।" এই বলে বেড়াল কোন দিকে চলে গেল।

আমি সিঁড়ির ধাপে বসে যেমন কৌটোতে ফুঁ দিয়েছি, অমনি তার ডালা আপনি খুলে গেল, আর তার ভিতর থেকে একটি ছোট নীল-রঙের পাখি ফড়-ফড় করে উড়ে সেই সোনার দাঁড়ে গিয়ে বসে শিশ দিতে লাগল। তার একটু পরে জোটেবুড়িমা কি জানি কোথা থেকে



এসে সিংহাসনে বসলেন। বুড়িমার আজকের সাজ দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলুম।

তাঁর পরনে একখানি যুঁইফুলের শাড়ি, তাতে চন্দ্রমল্লিকার পাড় বসানো। গলায় শিউলীফুলের সাত-লহর। মাথায় নব-দূর্বাদলের চমৎকার একটি মুকুট, তাতে ফোঁটা-ফোঁটা শিশির পড়ে হীরের মতো চিকচিক করছে। তাঁর দুই কানে সদাসোহাগিণী ফুলের কানবালা—আর কপালে জ্বলজ্বল করছিল সন্ধ্যাতারার একটি টিপ।

এই সাজে জোটেবুড়িমা সিংহাসনে বসতেই সমস্ত ঘর একটা নতুন রকমের আলোয় ভরে গেল।

আমরা তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে জোড় হাতে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম।

বুড়িমা আমাদের আশীর্বাদ করে বলতে লাগলেন, "মহারাজ, তোমার ছেলে নিচুয়া ভালো আছে। সে সাত-দিন সাতরাত দু-মুখো রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করে রাক্ষসকে বধ করে তার দুটো জিভ কেটে নিয়ে আমার বেড়ালকে খাইয়েছে। তার সাহস দেখে খুশি হয়ে তাকে চুটুপালু বনের রাজা করে দিয়েছি, এখন সে সোনার সিংহাসনে

বসে রাজচ্ছত্র মাথায় দিয়ে সুখে রাজত্ব করছে। টিয়ে-সাহেব, তোমার ছেলেও খুব সাহস দেখিয়েছে—সে বরাবর নিচুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল, আমি তাকে নিচুয়া-মহারাজের মন্ত্রী করে দিয়েছি। এখন তোমরা আহারাদি করে আজ রাত্তিরে আমার এখানে থাক। কাল সকালে আমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে তোমাদের চুটুপালু বনে নিচুয়া-মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখে আসব।"

এই বলে বুড়িমা অন্তর্ধান হলেন।

আমরা আহারাদি করে সেই নীল পাখির গান শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

এমন সময় কে বলে উঠল, "হুজুর, চা ঠিক হয়েছে।"

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, দোতলার বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আছি। সামনের টেবিলে সকালের চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে ফকির এক পাশে দাঁড়িয়ে। আর পাড়ার বুড়ো পূর্ণবাবু হুঁকো হাতে আমার সামনে একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ কোলে করে ঢুলছেন॥



